রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী বিরজানন্দজীর ভূমিকা

স্বামী বলভদ্রানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন উভয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। দক্ষিণেশ্বর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্ঘ গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন—যেটি সম্ভবত তখন ভাবী সঙ্ঘনেতা ও সঙ্ঘের ভাবী সদস্যবৃন্দ বুঝতেও পারেননি। শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে সেই সঙ্ঘের সারভাগটি (nucleusটি) ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বরানগরে যে-মঠটি গড়ে উঠেছিল, সেটিই প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের যে-পার্ষদরা ত্যাগের জীবন গ্রহণ করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন, তাঁরা বরানগরের মঠবাড়িতেই প্রথম শাস্ত্রসম্মতভাবে বিরজাহোম অনুষ্ঠান করে গৈরিক ধারণ করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে শুরু করেছিলেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে রামকৃষ্ণ মঠের সূচনাকাল ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় আর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে। উভয় প্রতিষ্ঠানের আইনগতভাবে যথাক্রমে ট্রাস্ট ও সোসাইটি হিসেবে রেজিস্ট্রিকরণ হয় আরও পরে। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়ে যে-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, তা একশো ছত্রিশ বছর ধরে প্রবহমান এবং স্বামীজীর ঋষিদৃষ্টি অনুযায়ী তা প্রবহমান থাকবে অন্তত দেড় হাজার বছর।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎস ও চিরন্তন কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন, আদ্যাশক্তির শক্তিতে অবতারলীলা। যদি এই উক্তির মাপকাঠিতে বিচার করি, তাহলে বলতে হয় শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নয়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎস ও কেন্দ্র যুগ্মভাবে রামকৃষ্ণ-সারদা। রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার গোমুখ তাঁরাই। সেই ধারাকে জগৎকল্যাণে মর্তে নামিয়ে এনেছেন স্বামীজী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার অসীম জীবনের সারমর্মকে সাধারণ মানুষের ধারণার গোচরে এনে তাদের আচরণের উপযোগী করে তুলেছেন স্বামীজীই। কারণ, তিনিই সর্বদা ছিলেন, তাঁর মহান গুরুভাইদের কাছেও, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর অনন্য ভাষ্যকার। তাঁর সঙ্গগুণেই গুরুভাইদের মনে ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু একজন শক্তিশালী সিদ্ধগুরু নন; তিনি পূর্বগ সকল অবতারের সমষ্টিস্বরূপ। শ্রীশ্রীমাও যে মূর্তিমতী আদ্যাশক্তি, ভারতে তথা জগতে নারীশক্তির জাগরণের জন্যই যে তাঁর আবির্ভাব, তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের অংশস্বরূপিণী, তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী ও

সঙ্ঘজননী—সারদা দেবী সম্পর্কিত এই সত্যগুলিও তিনিই প্রথম গুরুভাইদের কাছে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। এককথায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর জীবন ও বাণীর আকাশসম ব্যাপ্তি ও সমুদ্রসম গভীরতা তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন স্বামীজীই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীকে উৎসরূপে ধরে স্বামীজী সহ ষোলোজন সন্ন্যাসী-পার্ষদকে নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম প্রজন্ম এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দেহত্যাগ পর্যন্ত তাঁরাই ছিলেন সঙ্ঘ পরিচালনার দায়িত্বে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিগূঢ় ইচ্ছায় তাঁরা চলে যাওয়ার আগেই সঙ্ঘের বরানগর মঠ পর্যায় থেকেই একদল ত্যাগেচ্ছু শিক্ষিত যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা হলেন—খগেন, সুধীর, কালীকৃষ্ণ, হরিপদ, গোবিন্দ (শুকুল) ও সুশীল। পরবর্তী কালে এঁরা সঙ্ঘে যোগদান করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; নাম হয়েছিল যথাক্রমে স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ। স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission' গ্রন্থে কলকাতার এই তরুণদলটি সম্বন্ধে বলেছেন, ''...this group succeeded as leaders the direct disciples of the Master.'' এই দলটিই নেতা হিসাবে পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-পার্ষদদের উত্তরসূরি হয়ে উঠেছিলেন। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতৃত্ব পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের কাছ থেকে এঁদের স্কন্ধে এসে পড়েছিল।

স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সদানন্দ প্রমুখের নামও একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের জীবন সঙ্ঘের ভাব, আদর্শ ও কর্মধারাকে সেতুর মতন পরবর্তী প্রজন্মে বহন করে নিয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী বিরজানন্দজীর জীবন ও অবদান আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর জন্ম ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর, কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের সারপেনটাইন লেনে; দেহান্ত ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর। ছেষট্টি বছরের প্রদীপ্ত জীবনকাল। ১৮৯০ সাল থেকে তাঁর বরানগর মঠে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে যাতায়াত এবং পার্ষদ মহারাজদের সঙ্গলাভ। স্বামীজীর বিশ্বজয় সংক্রান্ত খবরগুলি তিনি গোগ্রাসে পড়তেন। ১৮৯৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার কলকাতাবাসীর সঙ্গে সুধীরও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, কখন বজবজ থেকে স্বামীজীকে নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন আসবে। সেদিন জীবনদেবতাকে সুধীর প্রাণভরে প্রথম দর্শন করেছিলেন। এর কিছুদিন পর থেকে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে যাতায়াত করে সুধীর নিয়মিতভাবে স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেন।

'জীবন্ত উপনিষদে'র কাছে উপনিষদ ব্যাখ্যা শ্রবণের পর, তাঁর আকর্ষণ প্রতিহত করে সংসারে থাকা সুধীরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৮৯৭-র এপ্রিল মাসে তিনি গৃহত্যাগ করে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। স্বামীজী তাঁকে পেয়ে পরম আনন্দিত হন। শুদ্ধচিত্ত ত্যাগব্রতী সুধীরকে স্বামীজীই 'ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ' নামে দলভুক্ত করেন এবং ১৮৯৭-র মে মাসের কোনও একদিন তাঁকে কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দেন। আলমবাজার মঠে স্বামীজী মঠের নতুন সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য যে-নিয়মাবলি প্রস্তুত করেন, তা তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করেছিলেন শুদ্ধানন্দজী।

শুদ্ধানন্দজীর প্রধান অবদান স্বামীজীর ইংরেজি বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদ—যা 'স্বামী বিবেকানন্দের

বাণী ও রচনা' নামে বাংলাভাষী পাঠকদের মধ্যে সুপরিচিত। বৃদ্ধ অদ্বৈতানন্দজী ভাল ইংরেজি জানতেন না, অথচ তাঁর বিশেষ ইচ্ছা তাঁদের 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে সাহেবদের কাছে কী বলল তা শোনা। শুদ্ধানন্দজী ও অন্যান্য নতুন ব্রহ্মচারীরা তাই মুখে মুখে স্বামীজীর ইংরেজি বক্তৃতাগুলির বাংলা তর্জমা করে তাঁকে শোনাতেন। প্রেমানন্দজী তা জেনে স্বামীজীর ইংরেজি বক্তৃতাগুলির অনুবাদ করতে নবীন ব্রহ্মচারীদের উৎসাহ দেন, তাঁরাও সোৎসাহে সেই কাজে লেগে পড়েন। একদিন স্বয়ং স্বামীজী খুব প্রসন্নমনে ব্রহ্মচারীদের কৃত অনুবাদগুলি শুনেছিলেন। সম্ভবত শুদ্ধানন্দের অনুবাদটি তাঁর বিশেষ পছন্দ হয়েছিল; কারণ এর কিছুদিন পরে, স্বামীজীর কাছে যখন শুদ্ধানন্দজীই শুধু আছেন, তখন তিনি হঠাৎ তাঁকে বলেন, ''রাজযোগটা তর্জমা কর না।'' বিনয়ী শুদ্ধানন্দজী নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করলেও স্বামীজীর আদেশে অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থের লেখক এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''শুদ্ধানন্দও অতি নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এই অনুবাদের কার্যে। ক্রমে তিনি স্বামীজীর কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থগুলিরও অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীগুরুর ভাব ভাষা ও ভাবনায় তিনি এমনই প্রভাবিত ছিলেন, তাঁহার অনুবাদকে স্বামীজীর মূল রচনা বলিয়াই মনে হয়। স্বামীজীর রচিত 'The Song of the Sannyasin'-এর কাব্যানুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি'-তে তিনি আশ্চর্য বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যই ইহার তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের ভাব-প্রচারের ইতিহাসে শুদ্ধানন্দজীর নাম তাই চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের বাণীকে শুদ্ধানন্দজীই পৌঁছাইয়া দিয়াছেন—এ কথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে।''

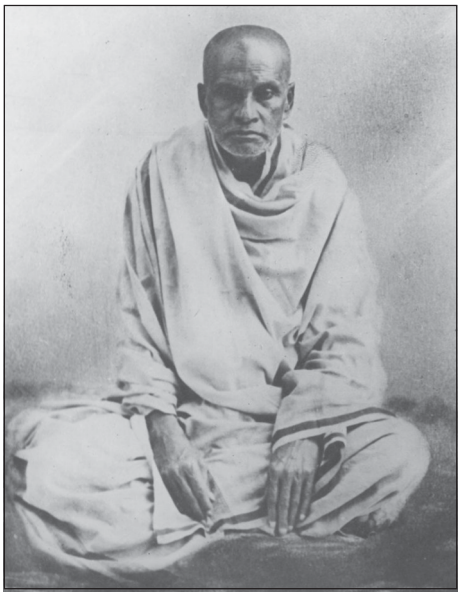

শুদ্ধানন্দজী শ্রুতিধর ছিলেন। স্বামীজী একবার বেলুড় মঠে গীতা সম্পর্কে খুব উদ্দীপনাময় অনেক কথা বলেছিলেন। প্রেমানন্দজীর আগ্রহে প্রায় তিন-চারদিন পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ হুবহু স্বামীজীর কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সেটিই 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হয়। শুধু আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি ও অনুবাদ-দক্ষতাই নয়, শুদ্ধানন্দজীর মধ্যে একই সঙ্গে তপস্যা, শাস্ত্রানুরাগ, সাধনভজন এবং কর্মনিষ্ঠার দুর্লভ সমাবেশ হয়েছিল।

১৮৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত হতে শুরু হয় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র উদ্বোধন। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, এই পত্রিকার মাধ্যমে ধর্ম, সাহিত্য, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস সবক্ষেত্রে ইতিবাচক ও মৌলিক ভাবসমূহ প্রকাশিত হবে; বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও নতুন ওজস্বী রীতির প্রবর্তন করবে 'উদ্বোধন'। উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক হলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী এবং 'স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী' শুদ্ধানন্দজী এই 'উদ্বোধন' পরিচালনায় ত্রিগুণাতীতানন্দজীর সহকারী—শুধু সহকারী নয়,

তাঁর ডানহাত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০২-এর ডিসেম্বর মাসে ত্রিগুণাতীতানন্দজী আমেরিকায় চলে গেলে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধানন্দজীর উপরেই এসে পড়ে। দীর্ঘ দশ বছর তিনি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে উদ্বোধনের সম্পাদনা করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করতে হত তাঁকে, অনেক সময় রাত জেগে প্রুফ দেখতে হত। তিনি বলতেন, কালীপুজোয় সারারাত জেগে তিনি যে-আনন্দ পেতেন, রাত জেগে প্রুফ দেখেও একই আনন্দ পেতেন। কাজ তাঁর জীবনে পূজায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর সময়েই উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সারদানন্দজীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', স্বামীজীর বক্তৃতাবলির বঙ্গানুবাদ। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থের ভাষায় : ''বস্তুতপক্ষে শুদ্ধানন্দের করস্পর্শে 'উদ্বোধন' নবীনজীবন লাভ করিয়াছিল—জাতির সাংস্কৃতিক উদ্বোধনে 'উদ্বোধন' যথার্থই সেদিন এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'উদ্বোধন'-এর ইতিহাসে ইহা এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। 'উদ্বোধন' হইতে স্বামীজীর রচনাবলীর গ্রন্থাকারে প্রকাশও শুদ্ধানন্দেরই অক্ষয়কীর্তি।''

শুদ্ধানন্দজীর কর্মপরিধি কেবলমাত্র সঙ্ঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় কলকাতার যুবকগণ স্বামীজীর আদর্শ পরিবহন করার জন্য যে বিবেকানন্দ সোসাইটি গঠন করেছিলেন, সারদানন্দজী ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক এবং শুদ্ধানন্দজী ছিলেন তার প্রাণ। তাঁর গুরুর পুণ্যনাম বহনকারী এই সংস্থাটিকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। কখনও কখনও অনেক অসুবিধা করেও কলকাতায় থেকে তিনি এই সোসাইটির সংগঠনকার্যে রত থেকেছেন। তরুণদের সঙ্গে তিনি তাঁদের মতো করে মিশতেন এবং ভালবাসা ও সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা তাঁদের মধ্যে 'বিবেকানন্দ-তড়িৎ' সঞ্চার করতেন। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''সোসাইটিতে এমন ধর্মভাবের তরঙ্গ তোল যাহাতে উহা 'বিবেকানন্দ' নামের যোগ্য হয়।'' এই সোসাইটির সূত্রে যেসব তরুণ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই গৃহত্যাগ করে মঠে যোগ দিয়েছেন, আর যাঁরা সংসারেই থেকে গেছেন, তাঁরা ঈশ্বরকেন্দ্রিক গৃহজীবনের সন্ধান পেয়েছেন শুদ্ধানন্দজীর কাছে।

১৯০৩ সাল থেকে শুদ্ধানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের কেন্দ্রীয় পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য হন, যে-পদটির আইনগত নাম 'ট্রাস্টি'। রামকৃষ্ণ মিশন 'সোসাইটি' হিসেবে রেজিস্টার্ড হয় ১৯০৯ সালে এবং সেই বছরই তার প্রথম 'গভর্নিং বডি' তৈরি হয়। সেই গভর্নিং বডিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা ছাড়া আর দুজন সন্ন্যাসী মাত্র ছিলেন—স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও বিরজানন্দজী। 'Office-bearer' বা পদাধিকারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন অ-পার্ষদ। তিনি ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সারদানন্দজী যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন, শুদ্ধানন্দজী ছিলেন তাঁর ডানহাত এবং অতি তরুণ বয়সেই তিনি মঠ-মিশনের যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার উপর সারদানন্দজীর এত আস্থা ছিল যে, শুদ্ধানন্দজী দেখে না দিলে তিনি সঙ্ঘ-পরিচালনা সংক্রান্ত কোনও কাগজে সই করতেন না।

শুদ্ধানন্দজীর আর একটি অবদান, শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণের পর মায়ের একনিষ্ঠ সেবক অরূপানন্দজীর উদ্যোগে সংগৃহীত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ও সংশোধন। যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে প্রথমে স্বামী সারদানন্দজীকেই সকলে অনুরোধ করেছিলেন এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনি ওই গ্রন্থের সম্পাদনা করতে রাজি হন এই শর্তে, ''সুধীর আমার সঙ্গে থাকলে দেখব।'' বস্তুত দুজনে মিলেই

বইটির সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেন। বইটির কাজ করতে করতে শুদ্ধানন্দজী একদিন বলেছিলেন, ''স্বামীজী বলেছেন, 'ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে।' আমি দেখছি, মায়ের এক-একটা কথা নিয়ে হাজার হাজার পুস্তক তৈরি হতে পারে।''

এই সময়ের আর একটি মহৎ কাজ ইংরেজি জীবনী অনুযায়ী বাংলাভাষায় স্বামীজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করানো। একাজেও শুদ্ধানন্দজী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন, যার ফলে প্রমথনাথ বসু বাংলায় স্বামীজীর একটি সার্থক জীবনীগ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে বেলুড় মঠে সাতদিন ব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন (First Convention) হয়। এই মহাসম্মেলনের চিন্তাটি শুদ্ধানন্দজীরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। তিনি সেটি সারদানন্দজীকে বলেন, সারদানন্দজী অনুমোদন করেন এবং তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহাসম্মেলনের বিবরণীতে তাই লিপিবদ্ধ দেখা যায় : ''It was solely through the unbounded enthusiasm and the unremitting labours of Swami Suddhananda that the idea of the convention materialised. ''

১৯২৭-এর আগস্ট মাসে সারদানন্দজীর দেহত্যাগ হলে শুদ্ধানন্দজী মঠ-মিশনের সম্পাদক হন। এই গুরুদায়িত্ব তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অতি সুচারুভাবে পালন করেন। মাঝে ১৯৩০ সালের মার্চ মাস থেকে একবছর তিনি স্বাস্থ্যের কারণে বিশ্রাম নেন—তখন স্বামী বিরজানন্দজী সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

শুদ্ধানন্দজীর সম্পাদকতা-কাল মঠ-মিশনের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই সময় বহু জটিল পরিস্থিতির যেমন উদ্ভব হয়েছে, তেমনই তাঁর অসামান্য পরিচালনাগুণে সেইসব সমস্যার সমাধানও হয়েছে। তাঁর সাধুত্ব, মনস্বিতা, স্থৈর্য ও কর্মকুশলতা সবরকম পরিস্থিতিতেই সঙ্ঘকে তার স্বীয় মর্যাদায় ও স্বকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকতে সহায়তা করে গেছে। সঙ্ঘের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েও তাঁর জীবনে ধ্যানধারণাদি ও স্বাধ্যায়ের জন্য কোনও সময়াভাব হয়নি। সম্পাদক থাকাকালীনও তিনি প্রতিদিন একঘণ্টা করে দুবার সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য শাস্ত্র-অধ্যাপনা করতেন। শোনা যায় গল্পচ্ছলে ভগবৎপ্রসঙ্গকে স্বামীজী 'চর্চা' বলতেন। 'চর্চা' কথাটি ও বিষয়টি স্বামীজীর খুব পছন্দ ছিল। গুরুর অনুসরণে শুদ্ধানন্দজী তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের বন্ধুর মতো ডেকে মাঝে মাঝেই বলতেন, ''এসো হে, কিছু চর্চা করা যাক'', এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বিষয়ে 'চর্চা' করতেন।

তাঁর একজন জীবনীকার লিখেছেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহুধা প্রসার ও পরিবৃদ্ধির মূলে শুদ্ধানন্দজীর সাধনা ও ত্যাগের পরিসংখ্যান করা সত্যই দুঃসাধ্য।... তিনি ছিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জীবন্ত ইতিহাস।'' মঠ-মিশনের বহু কেন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম ঢাকা আশ্রম। 'রামকৃষ্ণ মিশন' বলতে শুদ্ধানন্দজী বুঝতেন শ্রীরামকৃষ্ণের মিশন বা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার। রামকৃষ্ণ মিশনের সমগ্র কার্যাবলির একটিমাত্র উদ্দেশ্যই তিনি জানতেন, সেটি হল—ঠাকুরের মহিমা-প্রচার। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বড় কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''দেখ স্বামীজীর কৃপায়, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আমি এইটুকুই বুঝেছি যে, আমাদের সব কর্ম—তা রিলিফ্ই হোক, স্কুল-কলেজই হোক, বা ডাক্তারখানা-হাসপাতালই হোক, অথবা বক্তৃতা দেওয়া-ক্লাসকরা যাই হোক, সবই হচ্ছে ভগবদ্-উপাসনা,—তাঁরই মহিমা প্রচার। মিশনের প্রত্যেকটি কাজের ভাব হচ্ছে—শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যক্ত করা। লোকে যেন আমাদের

কাজকর্ম দেখে আমাদের দিকে নয়—ঠাকুর স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর স্বামীজীকে প্রকাশ করাই আমাদের জীবন,—আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন। আর তা যদি না হয়—তা হলে বাপু, এইসব কাজ, তা যত বড়োই হোক, আর যা-ই হোক—স্বামীজীর কাজ নয়, ঠাকুরেরও মিশন নয়।"

১৯৩৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে শুদ্ধানন্দজী সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়েছিলেন, এবং বিজ্ঞানানন্দজীর দেহত্যাগের পর ১৯৩৮-এর মে মাস থেকে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হন। অধ্যক্ষরূপে তাঁর ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তার বিকাশ হয়েছিল। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ তাঁর পুণ্য দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে গভীর প্রেরণা ও আনন্দ পেতেন। শুদ্ধানন্দজীর দেহত্যাগের পর তাঁর স্মরণসভায় মাধবানন্দজী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন, ''শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট যে সকল উপদেশ শুনিয়া ভাল বুঝিতে পারিতাম না, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইত না, সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন এবং তর্কবিতর্ক করিয়া বুঝিবার সুবিধা হইত স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকটে। স্বামীজীর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের ভাব ছিল তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল স্বামী শুদ্ধানন্দের ভিতরে। তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান এবং ভক্তির সামঞ্জস্য। তিনি অসাধারণ কর্মী ছিলেন, খুব পড়াশুনা এবং চিন্তা করিতেন। আবার তিনি ভক্তিমার্গের সাধকও ছিলেন, ধ্যান ধারণাও তাঁহার ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন একাধারে গুরু এবং বন্ধু।"

শুদ্ধানন্দজীর সমগ্র জীবন কর্মযোগ, ভক্তি ও বেদান্তবিচারের বিরল সমন্বয়। স্বামীজী সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও প্রসার সম্পর্কে যেসব কথা বলতেন বা ইঙ্গিত করতেন, শুদ্ধানন্দজীর কাছে সেগুলি বেদবাক্যের সমতুল্য ছিল। স্বামীজী মঠের নিয়মাবলিতে লিখে গেছেন, ''এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত। এই সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।" শুদ্ধানন্দজীর অতন্দ্র সঙ্ঘসেবা এই বিশ্বাসেরই ফলিত দৃষ্টান্ত।

স্বামী বিরজানন্দ

এবার পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী প্রসঙ্গ। স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পর যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি বিরজানন্দজী। আবার শুদ্ধানন্দজীর পর যিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তিনিও তিনিই, অর্থাৎ বিরজানন্দজী। বয়সে শুদ্ধানন্দজীর চেয়ে চোদ্দো মাসের ছোট। জন্মতারিখ : ১৮৭৩-র ১০ জুন। পিতামহ কালীভক্ত, মাতামহ কৃষ্ণভক্ত। তাঁর জন্মের শুভসংবাদটি শোনামাত্রই পিতামহ বলে উঠলেন, 'কালী কালী', আর মাতামহ বলে উঠলেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। তাই এই রত্নশিশুটি পরিবারসূত্রে নাম লাভ করলেন 'কালীকৃষ্ণ'।

সিটি ও রিপন কলেজে পাঠরত যে-কয়েকটি যুবক পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের কথা শুদ্ধানন্দজী প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বরানগর মঠে ঠাকুরের পার্ষদদের সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন কালীকৃষ্ণ। তাঁদের প্রভাবে সতেরো বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করে তিনি বরানগর মঠে যোগ দেন ১৮৯১ সালে। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-পার্ষদদের পরে তিনিই সঙ্ঘের প্রথম ত্যগীভক্ত। মঠে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে তাঁর জীবন ক্রমশ আরও ত্যাগোজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। মঠের সবরকম কাজে তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীর ডানহাত হয়ে উঠলেন—সাধারণ কাজকর্ম থেকে শুরু করে ঠাকুরসেবায় পর্যন্ত।

ভোরে উঠে ঠাকুরের ফুল তোলা, সমস্ত মঠ ঝাঁট দেওয়া, সন্ন্যাসীদের সারাদিনের ব্যবহারের জন্য পুকুর থেকে জল তোলা, ঠাকুরঘরে যাবতীয় কাজ সহ রুটি বেলা, পূজার বাসন এবং সাধুদেরও এঁটো বাসন মাজা, রাত্রে তাঁদের মশারি টাঙানো—কালীকৃষ্ণ সব কাজ স্বেচ্ছায় মহানন্দে করতেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। এই সময়কার অভিজ্ঞতা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাষায় : ''এইসব সেবা করতে খুব আনন্দ হত। কেউ 'তুই কী করে এত করবি?' বলে কাজের সহায়তা করতে এলে তাঁর হাত থেকে জোর করে কাজ কেড়ে নিতুম। কোনও কাজ যথা বাসন মাজা, জল তোলা তাঁরা (সন্ন্যাসি-পার্ষদরা) পরে করবেন বলে আমায় করতে না দিলে তাঁরা দুপুরবেলা খাবার পর বিশ্রাম করতে গেলে চুপি চুপি সেই সব কাজ সেরে রাখতুম।'' সেবার ভাব কালীকৃষ্ণের স্বভাবগত ছিল। সারদানন্দজী কাশীতে কঠোর তপস্যা করে ছ-মাস রক্ত-আমাশয়ে ভুগে এইসময় বরানগর মঠে ফিরে আসেন। সমস্ত কাজ করেও কালীকৃষ্ণ সময় করে গিয়ে তাঁর সেবা করতেন। তাঁর সেবায় মুগ্ধ হয়ে সারদানন্দজী বলেছিলেন, ''এই ছেলেটা কে রে, মায়ের মতো সেবা করে?'' কালীকৃষ্ণ একসময় গোপালের মায়েরও সেবা করেছিলেন।

১৮৯১ সালের অক্টোবরে জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষ্যে সারদানন্দজীর সঙ্গে তাঁর জয়রামবাটী যাওয়ার সুযোগ হল। শ্রীশ্রীমাকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। সেখানে তাঁরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন, যার ফলে প্রায় বছর খানেক কালীকৃষ্ণকে ভুগতে হল। ১৮৯৩-র মাঝামাঝি মা তাঁকে আদেশ করেন বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকতে—ওষুধপত্র আর পুষ্টিকর পথ্যাদি করে শরীরটা সারিয়ে নিতে। কালীকৃষ্ণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, কিন্তু তার মধ্যেই সান্ত্বনার উপকরণ পেয়ে গেলেন যোগীন মহারাজের পরামর্শে। মহারাজ তাঁকে বললেন বাড়ি যাওয়ার আগে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করতে। কালীকৃষ্ণ তা-ই করলেন, মা-ও কৃপা করে তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে কালীকৃষ্ণ সাময়িকভাবে বাড়ি চলে এলেন এবং গভীর সাধনভজনে ডুবে গেলেন। প্রায় দেড় বছর পর শ্রীশ্রীমায়ের এবং মাতাপিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯৫-এর অক্টোবরে তিনি আবার গৃহত্যাগ করে একমাস কাশীতে ও দেড় বছর বৃন্দাবনে স্বামী প্রেমানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যে তপস্যা করেন। স্বামীজী দেশে ফিরছেন শুনে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। স্বামীজী তার কয়েকদিন মাত্র আগে (১৮৯৭-র ১৯ ফেব্রুয়ারি) কলকাতায় পৌঁছেছেন।

স্বামীজীকে দেখে কালীকৃষ্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের ভাষায় : ''সেই সম্মোহন চক্ষু—যার কথা শুনেছিলাম ও আমেরিকার কাগজে cuttingএ পড়েছিলুম! তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে, কি অপরূপ মূর্তি—একাধারে সৌন্দর্য ও মহাশক্তির খেলা, একটা non-chalant ভাব, a dazzling personality! আমার first impression—ভালবাসা, ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত ভাব।'' স্বামীজী কালীকৃষ্ণের কথা ইতিমধ্যেই গুরুভাইদের কাছে শুনেছিলেন। তাই তিনি যখন স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করে প্রণাম করলেন, স্বামীজী তাঁর দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, ''ওঃ এই ছেলেটি বুঝি!''

এর কিছুদিন পরেই স্বামীজী কালীকৃষ্ণ এবং আরও তিনজনকে সন্ন্যাস দিলেন। ঠাকুরের ত্যাগী-পার্ষদদের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে এই প্রথম বিরজাহোম। কালীকৃষ্ণের নাম হল স্বামী বিরজানন্দ। অন্য তিনজন হলেন স্বামী প্রকাশানন্দ (সুশীল), নির্ভয়ানন্দ (কানাই), নিত্যানন্দ (যোগেন চাটুয্যে)। বিরজানন্দজী বলেছেন, ''আমাদের সন্ন্যাস-দীক্ষা দান করে স্বামীজীর সে কি আনন্দ! বোধ হয়

গৃহস্থের নবজাত পুত্র সন্তান হলেও এত আনন্দ হয় না।" স্বামীজী তাঁদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ''তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হয়েছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।"

এবার বিরজানন্দজীর শিক্ষা শুরু হল স্বামীজীর পদপ্রান্তে থেকে—যিনি ঠাকুরের প্রধান যন্ত্র, যাঁর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্ঘভাবনাকে রূপ দিয়েছেন। সে-শিক্ষা জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ভক্তি-র সমন্বিত আদর্শের। শ্রীগুরুর ব্যক্তিগত সেবা করবার দুর্লভ সৌভাগ্যও তিনি এইসময় পেয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর এল ১৮৯৭ সালের ১ মে-র সেই ঐতিহাসিক দিনটি। স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 'রামকৃষ্ণ মিশন'—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' যার ব্রত। এই সংস্থার ত্যাগী ও গৃহী সভ্যবৃন্দ মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাবে শুধুমাত্র জপ-ধ্যান-তপস্যার মাধ্যমেই নয়, মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি রেখে বিবিধ জগৎকল্যাণ-কার্যের মাধ্যমেও। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে ত্রাণের মাধ্যমে এই নতুন সঙ্ঘের জগৎসেবাব্রতের সূচনা হল। ১৮৯৭-র শেষাংশে স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী বিরজানন্দজীও দেওঘরে গিয়ে খুব দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবা করে এলেন।

বিদ্যাচর্চার অভাবে সন্ন্যাসিসঙ্ঘ নীচদশা লাভ করে, স্বামীজী মনে করতেন। তুরীয়ানন্দজী স্নেহভরে বিরজানন্দজীকে শাস্ত্রাদি পড়াতেন এবং বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠের আয়োজনের মাধ্যমে নিয়মিত সেই শাস্ত্র-অনুধ্যানের যেন পরীক্ষা হত। স্বামীজী ব্যবস্থা করেছিলেন : প্রতি রবিবারেই এক-একজনকে পালাক্রমে কোনও একটি বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠ করতে হবে। সেই অনুযায়ী বিরজানন্দজীকেও রবিবারের ওই সভাগুলিতে বলতে হত। তাঁর ভাষণ হরি মহারাজের বিশেষ প্রিয় ছিল, তিনি তাঁর বাচনভঙ্গির খুব প্রশংসা করতেন। এছাড়া বলরাম মন্দিরে অনুরূপ একটি সভায় বিরজানন্দজী পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, যেটি শুনে স্বামীজীও খুব খুশি হয়েছিলেন।

৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ বর্তমান বেলুড় মঠে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, আর ১ জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখ থেকে মঠ সম্পূর্ণভাবে সেখানে উঠে আসে। ১৮৯৯-র প্রথমভাগে স্বামীজী প্রচারকার্যের জন্য বিরজানন্দজী ও প্রকাশানন্দজীকে ঢাকায় পাঠাবেন ঠিক করলেন। প্রকাশানন্দজী সম্মত হলেন, কিন্তু বিরজানন্দজী অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, ''সাধন-ভজন কিছুই করলুম না, ভগবানকে এখনও উপলব্ধি করতে পারলুম না। আমি কী বক্তৃতা করব?" স্বামীজী বললেন, ''তুই তো আচার্যের অভিমান রেখে বলবিনি, সেবার ভাবে যেমন অপর দশটা কাজ করিস, বক্তৃতাও সেই ভাবে করবি।" এরপরও বিরজানন্দজী সম্মত না হলে স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''দেখ, নিজের মুক্তি যদি খুঁজিস তো নিশ্চয়ই জাহান্নামে যাবি, আর অপরের মুক্তির জন্য যদি কাজ করিস তো এখনই মুক্ত হয়ে যাবি।" এবার বিরজানন্দজী একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। 'স্বামীজীর আদেশ পালন করব'—এই সংকল্প মনের সব দ্বিধা দূর করে দিল। তিনি রাজি হলেন। এর কয়েকদিন পর স্বামীজী একদিন নিজে ঠাকুরঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ্যান ও পূজা করলেন, তারপর দুজনকে কাছে ডেকে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, ''বিশ্বাস কর, তাঁর শক্তি তোদের ভিতর সংক্রমিত হয়েছে। জানবি, সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টিশরীর।" বিরজানন্দজীকে তিনি সেদিন আরও অধিক কিছু দিয়েছিলেন। সেটি হল : উপযুক্ত প্রার্থীকে মন্ত্রদানের অধিকার এবং কী মন্ত্র দিতে হবে, তা-ও। সাধারণ দৃষ্টিতে

বিরজানন্দজী দীক্ষাগুরুর আসনে বসেছেন ১৯৩৮ সালের শেষে। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁর ঋষিদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বিরজানন্দজীর সেই ভবিষ্যৎ ভূমিকাটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর আগেই সেই নিমিত্ত তাঁকে চাপরাশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বিরজানন্দজী ও প্রকাশানন্দজী অতঃপর ১৮৯৯-এর ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গে প্রচারে গেলেন। কিছুদিন পরে স্বামীজী প্রকাশানন্দজীকে অন্য কাজের জন্য মঠে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু বিরজানন্দজী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সার্থকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ প্রচার করে মাস তিনেক বাদে বেলুড় মঠে ফিরলেন। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীনই একটি মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন—সেটি হল স্বামী যোগানন্দজীর দেহত্যাগ। ফিরে এসে শুনলেন, স্বামীজী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বলরাম মন্দিরে আছেন। আলমবাজার মঠ থেকেই তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিগত সেবাধিকার লাভ করেছিলেন। এবার তিনি বলরাম মন্দিরে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। স্বামীজী তাঁর সেবায় খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। স্বামীজীর তখন বহুমূত্র খুব বেড়েছে। রাত্রে তাঁর কখন কী প্রয়োজন হবে ভেবে বিরজানন্দজী সারারাত একটুও ঘুমোতেন না। আবার দিনের বেলাও স্বামীজীর জন্য পথ্য রান্না করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতেন বলে ঘুমোতেন না। এইভাবে স্বামীজীর সেবার জন্য দিনের পর দিন তিনি চব্বিশ ঘণ্টায় একটুও ঘুমোননি, অথচ স্বামীজীর কৃপায় কখনও ক্লান্তিবোধও করেননি। 'অতীতের স্মৃতি' গ্রন্থ অনুযায়ী, সেবার তিনি ২৪ মে ১৮৯৯ থেকে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ-যাত্রার দিন পর্যন্ত প্রায় একমাস স্বামীজীর সেবা করেছিলেন।

২০ জুন ১৮৯৯ স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার দিন স্থির হয়। এর দু-একদিন আগে স্বামীজী বিরজানন্দজীকে নিয়ে বেলুড় মঠে এলেন। যাত্রার আগের দিন রাতে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে 'সন্ন্যাসের আদর্শ' সম্বন্ধে স্বামীজী যে-ভাষণ দিলেন, তা বিরজানন্দজীর অন্তরে মুদ্রিত হয়ে গেল : ''সন্ন্যাসের অর্থ এককথায় মৃত্যুকে ভালবাসা। আত্মহত্যা নয়—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করা।'' পরদিন দুটি নৌকা করে স্বামীজী সহ অনেক সাধু চললেন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। বিরজানন্দও ছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে। মা তাঁদের তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। বেলা তিনটে নাগাদ সবাই গেলেন প্রিন্সেপ ঘাটে স্বামীজীকে বিদায় জানাতে। স্বামীজী যাত্রা করলেন—তাঁর সঙ্গে চললেন স্বামী তুরীয়ানন্দজী, ভগিনী নিবেদিতা ও সারদানন্দজীর ভাই।

ভারাক্রান্ত মনকে উপেক্ষা করে বিরজানন্দজী এরপর মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ। স্বামীজী পাশ্চাত্যযাত্রার আগেই তাঁদের এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। মায়াবতীতে তখন রয়েছেন স্বামী স্বরূপানন্দ, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। স্বামীজীর স্বপ্নের 'অদ্বৈত আশ্রম' গড়ে তোলার কাজ চলছে সেখানে। জঙ্গল কেটে আশ্রম তৈরি করতে হবে; সঙ্ঘের ইংরেজি মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশও সেখান থেকেই হবে। আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। বিরজানন্দজী পৌঁছনোর পর বিমলানন্দজী হলেন সহকারী ম্যানেজার; অচলানন্দজী বাড়িঘর তৈরি ও মেরামতের সব দায়িত্ব নিলেন। স্বরূপানন্দজী হলেন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক এবং বিরজানন্দজীর কাজ হল ''পি. ডব্লিউ. ডি. ডিপার্টমেন্ট—রাস্তা তৈরি, জঙ্গল পরিষ্কার এইসব।'' প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করতে

হত তাঁদের সকলকেই। বিরজানন্দজী লিখেছেন, ''খাওয়াদাওয়ার বড় কষ্ট ছিল। যাহোক, আমরা সকলে মিলে খুব আনন্দে ছিলুম এবং কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করতুম না।''

সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ যখন আশ্চর্য গতিতে এগোচ্ছে, তখনই হঠাৎ কঠিন অসুখে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু হল (২৮ অক্টোবর)। স্বামীজী তখন মিশরে ভ্রমণ করছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল ক্যাপ্টেন সেভিয়ার সম্ভবত ইহলোকে নেই। তিনি ভারতে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন এবং তাড়াতাড়ি জাহাজ ধরে মুম্বই পৌঁছলেন। সেবার ৯ ডিসেম্বর (১৯০০) স্বামীজী বেলুড় মঠে ফেরেন। মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি মায়াবতী যাবেন ঠিক করলেন। তারযোগে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে জানালেন, তিনি স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দকে নিয়ে ২৯ ডিসেম্বর (১৯০০) ট্রেনে করে কাঠগোদাম পৌঁছবেন। হাতে সময় খুব কম পাওয়া সত্ত্বেও বিরজানন্দজী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু কষ্টে স্বামীজীদের জন্য ডান্ডি, কুলি সব সংগ্রহ করলেন এবং মাত্র দুদিনে ৬৫ মাইল দুর্গম পার্বত্য পথ পায়ে হেঁটে ২৮ ডিসেম্বর রাত্রি ১২ টায় কাঠগোদাম পৌঁছলেন। স্বামীজীর ট্রেন পৌঁছল ভোর পাঁচটায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে লোকজন জুটিয়ে এত দীর্ঘ পথ হেঁটে যেভাবে বিরজানন্দজী প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেছেন, তা শুনে স্বামীজী খুব খুশি হয়ে তাঁকে বললেন, ''বাঃ বাঃ এই তো ঠিক আমার চেলা।''

ওই দিনটা কাঠগোদামেই কাটিয়ে ৩০ ডিসেম্বর সকাল থেকে তাঁরা হাঁটা শুরু করলেন। দ্বিতীয় দিনটি (৩১ ডিসেম্বর ১৯০০) সারাদিনই ছিল দুর্যোগপূর্ণ। এই রাতটি তাঁরা কাটিয়েছিলেন রাস্তার ধারের একটি পাহাড়ি দোকানে। পরদিনই শুরু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিন। এইভাবে প্রতিদিন প্রায় পনেরো-কুড়ি মাইল করে পথ হেঁটে পঞ্চম দিনে তাঁরা মায়াবতী পৌঁছেছিলেন (৩ জুন ১৯০১)। মায়াবতীতে দু-সপ্তাহ থেকে স্বামীজী বিদায় নিলেন। এবার অন্যপথে টনকপুর ও পিলিভিত হয়ে স্বামীজীর নামার ঠিক হল। স্বামীজী সদানন্দজীকে ডেকে বললেন, ''দেখ, এবার বিধিব্যবস্থার সব ভার কালীকৃষ্ণের উপর। ওর মাথা ঠাণ্ডা এবং হইচই করে না।'' পিলিভিতে নেমে স্বামীজী ও সদানন্দজী সেখান থেকে ট্রেন ধরলেন।

এরপর বিরজানন্দজী কয়েকদিনের জন্য কেদার-বদরী তীর্থ দর্শন করে এলেন। তারপর তিনি অদ্বৈত আশ্রম তথা 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র প্রচারের কাজে মাদার সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দের সঙ্গে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' গ্রাহক সংগ্রহের জন্য উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাত ও বোম্বাই প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। যেমন দেখেছিলেন বহু মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, তেমনি কিছুসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দুর ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এই ভ্রমণকালে একদিকে তিনি যেমন পেয়েছেন শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আতিথেয়তা, অপরদিকে আবার গালাগালি ও অবর্ণনীয় অপমান। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর এই প্রচার সফর খুবই সফল হয়েছিল। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের গ্রাহকসংখ্যা এর ফলে আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; অনেক মুসলমান সজ্জনও গ্রাহক হয়েছিলেন।

এই কাজ উপলক্ষ্যে বিরজানন্দজী যখন আমেদাবাদে, তখন একদিন সংবাদ পেলেন স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন। আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো তাঁর শরীর-মন স্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ অসুখের সময়ও স্বামীজী বিরজানন্দজীর সেবার কথা মনে করে সেবকদের বলেছিলেন, ''তোরা এতজন মিলে সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারছিস নি,

কালীকৃষ্ণ থাকলে ও একাই সব সামলে নিত।” স্বামীজী মাদার সেভিয়ার আর স্বরূপানন্দজীকে চিঠিও দিয়েছিলেন, বিরজানন্দজীকে চেয়ে। কিন্তু তাঁরা জানিয়েছিলেন, এখন তিনি গেলে ‘প্রবুদ্ধ ভারতে’র কাজে খুব ক্ষতি হবে। স্বামীজী আর অনুরোধ করেননি। একথা যখন বিরজানন্দজী জানলেন, তাঁর বুক ভেঙে গেল। মনের হাহাকার মেটানোর জন্য তিনি সাধনভজনে ডুবে গেলেন। আশ্রমের কিছু দূরে নির্জনতর পরিমণ্ডলে একটি কুঠিয়ায় গিয়ে একান্তচিত্তে সাধনায় মগ্ন হলেন। দৈনিক পনেরো-ষোলো ঘণ্টা জপধ্যান তখন তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস হয়ে গেল। কুঠিয়ার বাইরেও আসতেন না। স্বরূপানন্দজী আশ্রম থেকে তাঁর খাবার পাঠিয়ে দিতেন। এরকম একটানা সাত-আট মাস সাধনা করার পর তাঁর শরীর অবসন্ন ও মস্তিষ্ক দুর্বল হলে সকলের পরামর্শে তিনি মঠে আসেন। কোনও চিকিৎসাতেই উপকার হল না। এরপর তিনি জয়রামবাটী গেলে তাঁর শীর্ণ দেহ দেখে শ্রীশ্রীমা চমকে উঠলেন এবং তাঁর ব্যাধির কারণও বুঝলেন—সহস্রারে ধ্যান করা। মা তাঁকে উপদেশ দিলেন, প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে। মায়ের পরামর্শে তিনি অচিরেই ফল পেলেন। এতদিন এতজন চিকিৎসক যা করতে পারেননি, মায়ের একটি কথায় তা সম্ভব হল। এটি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ঘটনা। পরবর্তী কালে বিরজানন্দজী এই প্রসঙ্গে আবেগভরে বলতেন, ‘‘সিদ্ধগুরুর দরকার এই জন্যেই। মায়ের এই উপদেশ যদি না পেতুম তা হলে হয়তো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত, চিররুগ্ন থাকতুম অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটত।”

এরপরে কিছুদিন তিনি মঠাধ্যক্ষ রাজা মহারাজজীর ব্যক্তিগত সেবা ও চিঠিপত্র লেখার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ওপর রাজা মহারাজের এতই আস্থা ছিল যে, চিঠিপত্র সই করাতে গেলে প্রায়ই তিনি বলতেন, ‘‘তুমিই সই করে দাও।”

এই সময় রাজা মহারাজের টাইফয়েড হলে বিরজানন্দজী প্রাণপণে তাঁর সেবা করেন এবং বায়ু পরিবর্তনের জন্য মহারাজ শিমুলতলায় গেলে তিনিও তাঁর সঙ্গী হন। এরপর তিনি কনখলে গিয়ে তপস্যায় রত হলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর পবিত্র সঙ্গলাভও তাঁর কনখলে আসার আর একটি কারণ ছিল। সেই সময় মাধুকরী ও জপধ্যানে তাঁর মন নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় খবর পেলেন, গুরুভ্রাতা স্বরূপানন্দ নৈনিতালে দেহত্যাগ করেছেন। বিরজানন্দজী তৎক্ষণাৎ তপস্যা ছেড়ে মায়াবতীতে চলে এলেন। মঠ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকেই নিতে হল স্বরূপানন্দজীর জায়গায় অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব।

১৯০৬ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত বিরজানন্দজী

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৬ সালেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডি-র সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর সাত বছরের অধ্যক্ষতাকাল অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় আশ্রম ক্রমশ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রচার সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুটি প্রকাশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। একটি হল স্বরূপানন্দ-প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডে স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলির (Complete Works of Swami Vivekananda-র) প্রকাশ; অপরটি হল চার খণ্ডে স্বামীজীর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি জীবনী (Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples)-র প্রকাশনা ও মুদ্রণ।

সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত পর্যন্ত কোনও এক অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যেন তিনি গ্রন্থাবলি প্রকাশের কাজ করতেন। স্বরূপানন্দজী গ্রন্থাবলির প্রথম খণ্ডের অনেক উপাদান সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছিলেন। বিরজানন্দজী আরও উপাদান সংগ্রহ করলেন। ভারতের নানা প্রদেশের নানা স্থল থেকে এবং আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনাবলি সংগ্রহ ও একত্র করা সহজ ছিল না। সহজ কাজ ছিল না সংগৃহীত উপাদানগুলিকে লিপিকারদের অজ্ঞতাজনিত ত্রুটি থেকে মুক্ত করে বিষয়-অনুযায়ী গ্রন্থবদ্ধ করে সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের আনুষঙ্গিক কাজগুলি করা। কিন্তু স্বামীজীর আশীর্বাদে বিরজানন্দজী এই দুষ্কর কাজ শরীর ও মস্তিষ্কের অমানুষিক শ্রম প্রয়োগ করে যে-দক্ষতার সঙ্গে সম্ভব করেছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তার ফলে স্বামীজীর 'কমপ্লিট ওয়ার্কস' ভাগে ভাগে বের হতে থাকে। 'কমপ্লিট ওয়ার্কস'-এর পঞ্চম ভাগ প্রকাশের কাজও যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বিরজানন্দজী স্বামীজীর পূর্ণাঙ্গ জীবনীটির কাজ ধরলেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে তিনি সারদানন্দজীকে সংশোধন করতে পাঠালে তাতে সম্মত হয়েও প্রত্যুত্তরে সারদানন্দজী যা লিখেছিলেন তাতে সুস্পষ্ট যে, বিরজানন্দজী যে-একপ্রাণতা নিয়ে এই কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন তা একইসঙ্গে তাঁদের ভরসা ও উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সারদানন্দজী লিখেছিলেন, ''সংশোধন করিবার ভার লইলাম—কিন্তু বিশেষ কিছু add করিতে পারিব কি না বলিতে পারি না।... তোমার নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তুমি over work করিয়া শরীরটাকে একেবারে ভাঙ্গিও না। তুমি গেলে মায়াবতী আশ্রমটি উঠিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।'' কারণ, এই পত্র লেখার সময় স্বামী বিমলানন্দজীও প্রয়াত।

স্বামীজীর জীবনীর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা। অখণ্ডানন্দজী লিখলেন, ''যতক্ষণ পাঠ করি রোমাঞ্চিত শরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে যেন দেখিতে পাই।... তোমাদের সমবেত চেষ্টা ও অচলাভক্তির ফলে যেন শ্রীশ্রীস্বামীজীকে সর্বদা তোমাদের এই বইখানির মধ্যে ঢুকিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।... কেবলমাত্র এই একটি কাজের জন্যই 'অদ্বৈত আশ্রমে'র গৌরব ও অক্ষুণ্ণ চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিল! ২য় vol বাহির হইবামাত্রই যেন আমাকে মনে পড়ে।''

স্বামীজীর 'কমপ্লিট ওয়ার্কস'-এর বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত অংশগুলি পড়ে অভেদানন্দজী লিখেছিলেন, ''...translated part অতীব সুন্দর হইতেছে। East and West ['প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-র অনুবাদ] যতদূর দেখিয়াছি—beyond criticism। তাঁহার অমূল্য জ্ঞানরত্ন জগৎকে বিলাইয়া বাস্তবিকই জগৎকে ধনী করিতেছ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এ একটা মস্ত কাজ হচ্ছে—lecture

ফেক্‌চারের চেয়ে অনেক উচ্চতর কাজ। It was reserved for you—a Sannyasin with infinite patience and calmness as well as unflinching zeal."

প্রকাশমান জীবনীগ্রন্থের খণ্ডগুলি পড়তে পড়তে সতীর্থ শুদ্ধানন্দজীও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন, ''যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই বৃহদাকার জীবনীগুলি বাহির করিতেছ, অপর কেহ যে এরূপ করিতে পারিত আমার জানা নাই।"

স্বামীজী যখন মায়াবতী গিয়েছিলেন, তখন বিরজানন্দজী একদিন তাঁর কাছে কিছুদিন একান্তে তপস্যা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, স্বামীজী তাতে সম্মতি না দিয়ে বলেছিলেন, ''আমার শিষ্যরা তপস্যার থেকে কাজের দিকে বেশি ঝোঁক দেবে এই আমি চাই।" বিরজানন্দজী দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, ''তা ঠিকই। তবুও চরিত্রবল ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যার একান্ত প্রয়োজন আছে, অন্যথায় নিষ্কাম কর্মও ঠিক ঠিক করা সম্ভবপর হবে না।" এই কথা বলে বিরজানন্দজী চলে যাওয়ামাত্রই স্বামীজী অন্যদের বলেছিলেন, ''কালীকৃষ্ণ যা বলেছে তাই ঠিক। ওর হৃদয়টা আমি বুঝেছি। ধ্যানধারণা এবং সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনের কি আর তুলনা আছে?" বিরজানন্দজীর জীবনে আমরা চিরকাল তাই সাধনভজন ও কর্মের সমন্বিত আদর্শ দেখেছি।

মায়াবতীর অধ্যক্ষপদ ছেড়ে আবার তাঁর মন সাধনভজনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মাদার সেভিয়ারের সহায়তায় মায়াবতী থেকে দূরে হিমালয়ের নিভৃত অরণ্যাঞ্চলে সেই উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন তিনি, যেটি পরিচিত হয় 'বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল' নামে। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বারো বছর তিনি এই আশ্রমেই প্রধানত তপস্যা এবং সঙ্গে কিছু কাজ নিয়ে কাটিয়েছিলেন। এই আশ্রমে থাকাকালীনই তিনি স্বামীজীর ইংরেজি জীবনীগ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদনা ও প্রকাশের কাজ করেছিলেন।

১৯২৬ সালে মঠ ও মিশনের যে-প্রথম মহাসম্মেলন হয়, তাতে বরিষ্ঠ পরিচালকদের সহায়তা করার জন্য অপেক্ষাকৃত তরুণ সন্ন্যাসীদের নিয়ে একটি 'ওয়ার্কিং কমিটি' গঠিত হয়, তাতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে সেই কমিটির সেক্রেটারি করা হয়। প্রথমে তিনি রাজি ছিলেন না। সারদানন্দজী তাঁকে বলেন, ''তুমি আমাদের (ঠাকুরের সন্তানদের) পর সব থেকে প্রাচীন, তোমাকেই এই কমিটির সেক্রেটারি হতে হবে।" তিনি তখন সম্মত হন। ১৯৩০ সালে শুদ্ধানন্দজীর অসুস্থতার সময় একবছর তিনি মঠ-মিশনের সম্পাদক পদের দায়িত্বও পালন করেছেন। তারপর ১৯৩৪ সালে মহাপুরুষ মহারাজের দেহত্যাগের পর যখন অখণ্ডানন্দজী সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন, তখন তাঁকে স্থায়ীভাবে সম্পাদকের কর্মভার নিতে হয়। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

সম্পাদকরূপেও বিরজানন্দজীর ভাবমূর্তি সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। নবীন-প্রাচীন প্রতিটি সাধু ও ব্রহ্মচারীকে তিনি প্রীতি ও স্নেহের চোখে দেখতেন, সবার প্রতিই তাঁর অসামান্য দায়িত্ববোধ প্রকাশ পেত। তাঁর ব্যবহাররীতি ছিল এইরকম : সরাসরি 'কোরো না' বা 'করো' বলতেন না। খুব মিষ্টি কথায় বলে দিতেন কী অসুবিধা। চিঠিতেও তাই।

তিনি সম্পাদক থাকাকালীনই ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারত ও বিশ্বজুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় আহূত হয়েছিল আটদিন ব্যাপী এক বিরাট বিশ্বধর্মসম্মেলন (১ মার্চ থেকে ৮ মার্চ ১৯৩৭)।

তাঁর সম্পাদকতার সময়ই ১৯৩৮-এর ১৪ জানুয়ারি বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ

মন্দিরের উদ্বোধন করেন এবং এর পনেরো দিন পর (২৯ জানুয়ারি ১৯৩৮) তিনিই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর সূচনা করেন।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডানন্দজীর দেহত্যাগ হলে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মঠ-মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন এবং শুদ্ধানন্দজী সহ-অধ্যক্ষ। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে বিজ্ঞানানন্দজীর মহাপ্রয়াণ হলে বিরজানন্দজী হলেন সহ-অধ্যক্ষ এবং শুদ্ধানন্দজী অধ্যক্ষ। সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে বিরজানন্দজী আবার চলে গেলেন শ্যামলাতালে—দীর্ঘ সময় আবার সাধনভজনে কাটাবেন এই ভেবে। কিন্তু ওই বছরেরই ২৩ অক্টোবর শুদ্ধানন্দজীও শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে লীন হলেন। সঙ্ঘ-পরিচালকরা সবাই একবাক্যে বিরজানন্দজীকেই সঙ্ঘাধ্যক্ষ মনোনীত করলেন। তিনি বেলুড় মঠে চলে এলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখে।

১৯৫১-র ৩০ মে তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বারো বছর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতাকালের সিংহভাগ জুড়ে ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর ওপর দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝা বারবার প্রবাহিত হয়েছে। সেই সংকটকালে তাঁর ন্যায় স্থিতধী সন্ন্যাসীর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধিনায়কত্বে থাকা এবং মানুষকে সঠিক আধ্যাত্মিক দিঙ্‌নির্দেশ দিয়ে যাওয়াকে 'History of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'a blessing for the organisation' বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের পুনরুত্থান সম্পর্কে স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হবেই। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কলেজ 'বিদ্যামন্দির' তাঁর আশীর্বাদধন্য—তিনি তার ভিতস্থাপন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে স্বামীজী যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হবেই এবং ওই কলেজটিই হয়তো সেই ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়াস। স্বামীজী পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের বাস্তবায়ন সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মঠ-মিশনের সাধু-সম্মেলনে তিনি তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বলেছিলেন, ''I am sure, nothing will be wanting or will stand in the way to make the Women's Math a grand success."

পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর অনন্য জীবনটির পরিক্রমা শেষে যা মনে হয়, তা যথার্থই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্যধন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর নিম্নলিখিত কথা কটিতে : ''তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরাপর পার্ষদগণের প্রত্যক্ষ সহযোগ এত নিবিড়ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরগণেরই একজন বলিয়া মনে হইত।"

সঙ্ঘাধ্যক্ষ হলেও তিনি নিজেকে সঙ্ঘের সেবক বলেই মনে করতেন। সন্ন্যাসী-শিষ্যদের একবার তিনি বলেছিলেন, ''এই সঙ্ঘ সন্ন্যাসী-সেবক দিয়ে গঠিত। সঙ্ঘের মুখ্য সেবকরূপে আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সঙ্ঘের সবার সেবা করে যেতে ভালবাসা ও কর্তব্য দ্বারা বদ্ধ—তা আমি শারীরিকভাবে যতই অক্ষম হই না কেন।"

''জানবি, সঙ্ঘই ঠাকুরের সমষ্টিশরীর"—স্বামীজীর এই বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করে বিরজানন্দজী মনপ্রাণ সঙ্ঘের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবনে 'তপস্যা ও কর্মের একটি মাধুর্যময় সমন্বয়' সঙ্ঘের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ✠